# স্বেচ্ছামৃত্যু

সুমিত্রা পদ্মনাভন

'ইউথেনেশিয়া' —Euthanasia গ্রীক শব্দের অর্থ ভাল মৃত্যু (Eu = ভাল, thanatos = মৃত্যু)। অর্থাৎ 'মৃত্যু যখন কাম্য'। যখন বেঁচে থাকা আরও দুর্বিষহ। নিজের ইচ্ছায় হোক বা আত্মীয় - বন্ধু - পরিজনের ইচ্ছায় হোক, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোক, যখন মৃত্যুই বরং ভাল মনে হয়— তখন দুভাবে সেই মৃত্যুকে ডেকে আনা যায়। **এক**—ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায় চিরতরে। **দুই** —জীবনদায়ী চিকিৎসা, যেমন অক্সিজেন, স্যালাইন, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়ে রোগীকে মারা যেতে দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছামৃত্যুর এই গ্রীস প্রতিশব্দটাই ইংরাজিতে চালু। তাই বোঝা যায় বহু বছর আগে থেকেই এই ধারণাটা আছে। তখন মানুষের সমাজ এত জটিল ছিল না, দুর্নীতি এত সর্বগ্রাসী ছিল না। ভালবাসার মানুষকে কষ্ট পেতে দেখলে, যখন জানি সে আর সুস্থ হবে না কোনওদিন, তখন তাকে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু উপহার দেওয়াই তার জন্যে সবচেয়ে ভাল কাজ। আমরা এখন পোষা কুকুরকে, পা ভেঙে যাওয়া প্রিয় ঘোড়াকে যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে ঘুম পাড়িয়ে দিই। এটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে। সিদ্ধান্ত নেন পশুর মালিক, ইঞ্জেকশন দেন চিকিৎসক। ব্যাপারটা এতটাই সোজা এবং মানবিক। এখন, কেন মানুষের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াতে এত বাধা? আমরা জানি দুটো দেশে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনী, এক : হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড , দুই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন স্টেট। এই দুই জায়গায় একজন মানুষ স্বাধীনভাবে তার মৃত্যু নিজেই চাইতে পারে। আইনজীবি ও ডাক্তারের পরামর্শ ও সহায়তা নিয়েই কাজটি করা হয়। তবু যত লোক আত্মহত্যা করতে চায়, তারা সবাই শেষ পর্যন্ত করে না, কাউন্সেলিং -এর পর অনেকেরই সিদ্ধান্ত বদলে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অনেক রাজ্যে প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া চলে। অর্থাৎ মৃতপ্রায় মানুষকে তার বাড়ির লোকের অনুরোধে আর জীবনদায়ী ওষুধ - বিষুধ, যন্ত্রপাতি দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয় না। শুধুমাত্র 'বেঁচে থাকুক', এই অজুহাতে তার জীবনকে আর লম্বা করা হয় না।

আত্মহত্যার অধিকার কেন আইনী করা উচিৎ নয়, তার পক্ষে অনেকগুলো যুক্তি আছে যেগুলো এক একটা করে খণ্ডন করা যায় সহজেই।

**এক : জীবন দিতে পারি না, নেব কোন অধিকারে?** ঃ— এটা একেবারে বকওয়াস্। জীবন নিতে যদি এতই আপত্তি তাহলে এত যত্ন করে সুস্থ সবল যুবক যুবতীদের কেন মারণ অস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়? কেন যুদ্ধে পাঠানো হয় অপর দেশের একইরকম নির্দোষ মানুষদের মেরে ফেলার জন্য অস্ত্র হাতে দিয়ে? এটা যারা বলে– তারা আগে 'অস্ত্র' তৈরি বন্ধের প্রচেষ্টা শুরু করুক। সেনা বাহিনী তুলে দিক।

**দুই : ধর্মের বাধা :**– জৈন ধর্মে স্বেচ্ছামৃত্যু অনুমোদিত। সবাইকে বলে কয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে একজন মৃত্যুবরণ করতে পারে। কেউ বাধা দেয় না। জানি না সেটা কতটা যন্ত্রণাহীন, তবু তো একজন বয়স্ক মানুষকে তার নিজের জীবনের ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছে প্রয়োগ করার সম্মান দেওয়া হয়। এটাই বা কম কী! হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী এবং মহাকাব্যেও স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা পাওয়া যায়। তাছাড়া কোনও ধর্মের বারণ থাকলেই বা কি? 'ধর্ম মানি না' বলতে তো কোনও বাধা নেই।

**তিন :** কাউকে Terminally ill অর্থাৎ বাঁচার আর কোনও সম্ভাবনা নেই এমনভাবে অসুস্থ বলা হল, তারপর হয়ত দেখা গেল সেই রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হল, অথবা জানা গেল ডাক্তারদের বুঝতে ভুল হয়েছিল, ওটা আসলে সারতেও পারতো। তাহলে?

এক্ষেত্রে ভুল যাতে না হয় তার জন্য নিশ্চয়ই বিশিষ্ট একাধিক অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরী। তবে ভবিষ্যতে ওষুধ বেরোতে পারে— এটা কোনও যুক্তি নয়। তৎকালীনভাবে সারার সম্ভাবনা না থাকলে এবং রোগী কষ্ট ভোগ করলে রোগীর অনুরোধেও তার মৃত্যু ডেকে আনা অত্যন্ত মানবিক। আর রোগী যদি জ্ঞানে না থাকেন, নিজে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হ'ন, তাহলে যে বা যারা তার চিকিৎসা চালাচ্ছে তাদের ইচ্ছাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে খরচ বহন করলেও, দেখা যায় বহুদিন রোগী হাসপাতালের 'বেড' দখল করে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন, এবং রোগীর আত্মীয় স্বজন ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন, উৎসাহ হারাচ্ছেন। অথচ অনেক জলজ্যান্ত রোগীকে হাসপাতাল ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে স্থানের অভাবে। তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে বিশেষভাবে ICU বা ICCU - তে চিকিৎসা করালে তাদের বাঁচানো যেক, কিন্তু দেরী হয়ে যাওয়ার কারণে তারা মারা যাচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে কোমা বা সেরে ওঠা অসম্ভব এমন রোগীদের মৃত্যুকে মেনে নিতে তিনটে উপকার হয়– প্রথমত রোগীর আত্মীয়স্বজন অযথা খরচ ও পরিশ্রমের হাত থেকে বেঁচে যান। দ্বিতীয়ত— আমাদের দেশের অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থায়, যেখানে প্রয়োজনীয় শয্যাসংখ্যা নেই, সেখানে আরেকজন সেরে ওঠা সম্ভব এমন রোগীকে ভর্তি করা যায়। তৃতীয় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথম রোগীর মৃতদেহ দান করা যায় হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই। তার দেহের সুস্থ অঙ্গ অনেকগুলি মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে। এটা একটা অত্যন্ত মানবিক কাজ, যেটা রোগীর আত্মীয়পরিজনই শুধু করতে পারেন। নিয়ম হচ্ছে মৃত্যুর পর অপারেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অঙ্গ সংগ্রহ করে হাসপাতাল দেহ ফিরিয়ে দেয় এবং তখন আত্মীয়রা তার সৎকার করতে পারেন।

মনে পড়ছে হায়দ্রাবাদের ভেঙ্কটেশকে, যে ২০০৪ সালে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে দেহদান করতে চেয়েছিল। কুড়ি বছরের ছেলেটির মায়েরও সায় ছিল এতে। কিন্তু সম্ভব হল না শুধুমাত্র 'স্বেচ্ছামৃত্যু বেআইনী' —এই কারণে। এর ফল হ'ল–

১। ছেলেটি মারাই গেল— আরও কিছু বেশিক্ষণ কষ্ট পেয়ে।

২। তার শেষ ইচ্ছা পূরণ হল না। মা আরও বেশি দুঃখ পেলেন।

৩। তার দেহ কোন কাজে লাগলো না। তার দেহাংশ নিয়ে অন্তত চার-পাঁচ জনকে অবশ্যমৃত্যুর হাত

থেকে বাঁচানো যেত। দশ বারো জনের বিভিন্ন দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা যেত।

এই আইন কার জন্য? মানুষের ভালর জন্যে, না, আইন শুধু আইনের জন্য? একসময় গর্ভপাতকেও তো হত্যা মনে করা হ'ত, বেআইনী ছিল। এখন মানুষের সুস্থ, সুন্দর জীবনের প্রতি সম্মান জানিয়েই গর্ভপাত আইনী। আইন পাল্টেছে। আশ্চর্য লাগে, বিদর্ভের কুড়ি জন কৃষক আত্মহত্যা করতে চেয়ে সরকারের কাছে চিঠি দিল। তাদের পা থেকে মাথার চুল অবধি বিকিয়ে গেছিল ঋণের দায়ে। তাদের তখন বাঁচার কোনও উপায় নেই, ইচ্ছাও নেই, সম্ভাবনাও নেই। কই সরকার তো বলল না— 'না আত্মহত্যা বেআইনী— আমরা তোমাদের বাঁচাবোই বাঁচাবো।' এখন পর্যন্ত হাজারের ওপর তুলোচাষী সরকারী অব্যবস্থার শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন গত তিন বছরে। রাষ্ট্র নিশ্চেষ্ট, বসে বসে দেখেছে। কে বলেছে আত্মহত্যা বেআইনী? অন্তত এই রাষ্ট্রের কোনও অধিকারই নেই এমন কথা বলার। সোমালিয়া থেকে আমলাশোলের মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়, মারা যায় উড়িষ্যার কালাহান্ডির মানুষ। রাষ্ট্রের তাহলে বক্তব্য— হ্যাঁ তোমরা ঋণে জর্জরিত হয়ে, অভুক্ত থেকে, চোখের সামনে শিশুসন্তানের মৃত্যু দেখেও বেঁচে থাকো, তিল তিল করে অপমান, অসহায়তা, অসুস্থতা নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও।

যে সরকার বাঁচার মত অবস্থা দিতে পারে না, জেনে বুঝেও ব্যবস্থা করতে পারে না—তার এ কথা বলা তো সাজেই না— বরং সে হত্যাকারী। আমরা জানি সরাসরি বধূহত্যা না করেও বধূর আত্মহত্যার দায় নিতে হয় শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামীকে। আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী হিসাবে। তাহলে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কেন হত্যাকারী হিসাবে শাস্তি পাবে না? তাই, বাঁচবে কি বাঁচবে না, সেটা যার জীবন সে-ই ঠিক করে। এখানে রাষ্ট্রের কিছু বলারই থাকতে পারে না। হঠাৎ করে আবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক। তাকে আটকাতে পারে তার নিকটজন। কাউন্সেলিং -এর ব্যবস্থা করে তাকে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর আঠারো বছর বয়সের নিচে কোনো শিশু বা কিশোর - কিশোরী আত্মহত্যা করলে অবশ্য তার দায় নিতে হবে তার পিতামাতাকে। তাদেরই তো কর্তব্য তাদের সন্তানের জীবন সুস্থ, সুন্দর করার। তাদের জানার কথা ছিল, তাদের সন্তান সুখে নেই—তারা দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে আসি। একজন মানুষ তার জীবনের সায়াহ্নে এসে যদি মৃত্যুবরণ করতে চান যে কোনও কারণে, তাহলে তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান জানানো অবশ্যকর্তব্য। কারণ হিসাবে যা কিছু হতে পারে। হতে পারে অসুস্থতা, বার্ধক্য, অকালবার্ধক্য, একাকীত্ব, অনেক কিছুই। জীবনের শেষে মৃত্যুই সুন্দর, স্বাভাবিক। মৃত্যুকে কুৎসিত করেছে মানুষ। চিকিৎসা শাস্ত্র অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবহারকারী মানুষ অনেক সময়ে ভুলে যায় চিকিৎসার উদ্দেশ্য রোগ সারিয়ে তুলে মানুষকে সুস্থ সুন্দর জীবন ফিরিয়ে দেওয়া, জীবনকে শুধুমাত্র দীর্ঘায়িত করা নয়।

**চার,** সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি হচ্ছে আত্মহত্যা, স্বেচ্ছামৃত্যু বা ইউথেনেশিয়া আইনী করলে আইনের অপপ্রয়োগ হবে, অর্থাৎ তা 'হত্যার অধিকার' হয়ে যাবে সেই হত্যা অভিসন্ধিমূলকও হ'তে পারে। কিছু আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তাঁরা মনে করেন, 'আমাদের দেশে এই আইনের অপব্যবহার হবেই।' একটা কথা ভেবে দেখুন—'আমাদের দেশে' কথাটা বলার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? একটাই , আমাদের দেশে অনেক আইনেরই অপপ্রয়োগ হয়, বা বলা যায় বেশিরভাগ আইনেরই অপপ্রয়োগ হয়। তাই মৃত্যু -সংক্রান্ত আইন অপপ্রয়োগ হলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই তো? হ্যাঁ এখানে ৪৯৮-এ ধারায় বদমাইশ মেয়ে তার স্বামী, শ্বশুরকে জেলে ঢোকায়, সৎ, প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করতে ভুয়ো কেস সাজিয়ে নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়, প্রভাবশালী বড়মাপের চোর ডাকাতদের হয়ে টাকার বিনিময়ে জেল খেটে দেয় কোনও চালচুলোহীন গরীব মানুষ, ভুল চিকিৎসায় রোগী মারা গেলে বড় - বড় নার্সিংহোমের মালিক, ডাক্তারদের শাস্তি কখনই হয় না। কন্যা - ভ্রূণ হত্যা চলে বছরের পর বছর—কেউ ধরা পড়ে না (আমরা জানি আজ অবধি ধরা পড়েছে একজন ডাক্তার)। প্রভাবশালী একটি পুরুষ ও তার চাকর মিলে শিশুনিধন যজ্ঞ চালায় মাসের পর মাস। পুলিশ জানতে পারে না এবং জেনেও দোষীকেই সাহায্য করে। শিশুগুলি গরীব মানুষদের। এসবই হচ্ছে আইনের অ-প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ ও আইনের ফাঁক ফোঁকর। দুর্নীতিতে প্রথম সারিতে থাকা দেশে এটাই স্বাভাবিক। দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ সব দেশেই আছে। তারাই আইনের অপব্যবহার করে। কিন্তু যেখানে দুর্নীতি একেবারে উপর তলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে নামে সেখানে এটা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু তাই বলে আইন থাকবে না—এটা তো হাস্যকর যুক্তি। যেমন পুলিশ বলে হিউম্যান রাইটস্ -এর কর্মীদের জ্বালায় আমরা ভাল করে কাজই করতে পারি না— গ্রেপ্তার, মারধোর করতে গেলেই তারা রে রে করে ওঠে। তাই বলে কি পুলিশ থাকবে না? না হিউম্যান রাইট্স বলে কিছু থাকবে না? আর আইন সব দেশে সব কালের জন্য। কোনও দেশে তার প্রয়োগ ঠিকমত নাও হ'তে পারে এই ভেবে বসে থাকলে চলে না। আইন নীতিগতভাবে যেটা সম মানুষের জন্য ভাল সেটাই মেনে নেবে। তার প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে বিভিন্ন হ'তে পারে।

আমরা দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া-কে মহান মনে করি। দেশের স্বাধীনতার জন্য বা অন্য কোন ন্যায্য দাবী নিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দিলে তাকে আটকাই না। বরং তারা সব হান শহীদ—এই মনে করি। পথ-দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় যেসব দেশে, তার মধ্যে আমাদের দেশ একেবারে প্রথম সারিতে। এ নিয়ে কারুর মাথাব্যথা নেই। শুধু কোনও বেচারা নিজে মৃত্যুবরণ করে তার দেহ অন্যের প্রয়োজনে দান করতে চাইলে যত বাধা! অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও তাকে বেঁচে থাকতেই হয়।

আমাদের দেশে তথা সারা পৃথিবীতে বহু লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে প্রতিবছর। তার সব কটি নথিভুক্তও হয় না আত্মহত্যা বলে। আমরা কেউ আটকাতেও পারি না এইসব মৃত্যু। স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার স্বীকার করে নিলে এইসব মৃত্যু আরও অনেক সুন্দর হবে। আইনের শৃঙ্খলার মধ্যে আনলে তা অনেক ন্যায়বিচার পাবে। ডাক্তার ও আইনজীবীর পরামর্শে এবং বাড়ির লোকের উপস্থিতিতে একজন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা মর্যাদা পাবে। সেক্ষেত্রে তার সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল বরং কম হবে, কারণ উইল করে যাওয়া বাধ্যতামূলক হবে।

কত বিকলাঙ্গ, অসুস্থ শিশু জন্মায় স্বল্প আয়ু নিয়ে। বাবা, মা চোখের জলে অপেক্ষা করে থাকে কবে সে মরে বাঁচবে? তার জীবনই শুধু যন্ত্রণাময় নয়, তার বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের জন্য এই শিশুর অস্তিত্বই কষ্টদায়ক। এখানে

শেষ কথা শিশুর বাবা, মা-ই বলতে পারেন। ডাক্তার সাহায্য করবেন শুধু।

আরেকটি উদাহরণ, যেটি আমাদের দেশে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক সেটা দিয়ে লেখা শেষ করব। সেটা হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি সমাজ তথা সংসারে ঔদাসীন্য। কি গ্রাম, কি শহর, কি নিম্নবিত্ত কি উচ্চবিত্ত— সর্বত্রই দেখা যায় শেষ জীবনে অশক্ত বৃদ্ধারা, উপার্জনহীন বৃদ্ধরা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েন। সরকার বা সমাজ কেউই আর এদের নিয়ে চিন্তিত নয়। ফলে যাঁরা বেশীদিন বাঁচেন তাঁদের অনেকেরই জোটে চরম অবহেলা, অযত্ন ও একাকীত্ব। সেটা দূর করার জন্য তেমন কোনও সামাজিক সচেতনতা এখনও দেখা যাচ্ছে না। না আছে তাঁদের জীবনে আনন্দের কোনো উপকরণ, না আছে তাঁদের অভিযোগ জানাবার কোন জায়গা। তাই জীবন দীর্ঘ হলেই সব সময় ভাল হয় না। তবু আমরা মৃত্যু চাইব না? যে কোনও প্রকারে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখব যতদিন পারি? —এটাও একরকম কুসংস্কার।

অবাধ শিশুজন্মের সময় শিশুমৃত্যুর হারও বেশি ছিল। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্মের উপর নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই সমাজকে আরও সুন্দর ও সুস্থতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? ঠিক সেরকম, চিকিৎসা ও বৃদ্ধদের পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপরও নিয়ন্ত্রণ আনা প্রয়োজন। আমরা নিশ্চয়ই চাই না পৃথিবী অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ, জীবন্মৃত বা অসুখী মানুষে ভরে যাক।

আইন ও ধর্মীয় অনুশাসন আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে চালিত করে। ধর্ম বলে, জীবন ঈশ্বরের দান, আমরা কেড়ে নিতে পারি না। আইনও এ ব্যাপারে ধর্মেরই হাত ধরাধরি করে আছে। একই যুক্তিতে ভ্রূণ হত্যাও এতকাল নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন ধর্মীয় অনুশাসন, বা বলা যায় ধর্মীয় অজ্ঞানতা ও আইন মানবতা বিরোধী মনে হয়— তখন? তখনই তো আইন পাল্টানোর দাবি ওঠে— তাই না? আইনের অপব্যবহার হতে পারে ভেবে আইন প্রণয়ন করবো না— এটা কেমন যুক্তি? আসলে জ্ঞানের প্রসার ও বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ধারণা ও আইন, পাল্টাতে বাধ্য। প্রতি বছর প্রচুর নতুন আইন তৈরি হচ্ছে সারা বিশ্বে। একসময়ে মানুষ মৃত্যুকে এতটাই ভয় পেত, অস্বাভাবিক মনে করত বলেই মৃত্যুর পর আত্মার কল্পনা, মৃতদেহ ঘিরে কুসংস্কার, মৃতমানুষকে নিয়ে শোকপালনের এত বাড়াবাড়ি। অমর হওয়ার চেষ্টা, মানুষের আয়ুকে বাড়ানোর নানারকম টোটকা, কলাকৌশল হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক চেষ্টা করেও গড় আয়ু বাড়াতে পেরেছে যৎসামান্য। এই গড় আয়ু বাড়ানোটাই একটা বিশাল অগ্রগমন। সত্যিকারের প্রজাতি হিসেবে একজন মানুষের সম্ভাব্য আয়ু বাড়াতে পেরেছে কী? তার সঙ্গে জীবনের শেষ দিন অবধি সুস্থ থাকার কৌশল? তা না হলে জীবনের দৈর্ঘ্যের কী মূল্য আছে? আজ আমরা স্বীকার করি রোগে ভোগে দীর্ঘ বার্ধক্যের 'অভিশাপ'। তাত্ত্বিক কারণে শুধু বাঁচার জন্য বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে তা দেখতে পাই সেই পুরোনো কুসংস্কার। অমরত্ব আজ আর জীবনের দৈর্ঘ্যে নয়— মানুষের কাছে, আবেদনে, তার ধ্যান - ধারণায়, তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যতায়।

যুগে যুগে আইনের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে বিরোধ মানবাধিকার কর্মীদের। এভাবেই নতুন আইন তৈরি হয়। ধর্মকথা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আপাতত মানবতার খাতিরেই আইন পাল্টানোর সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি জীবন যেমন আলাদা, প্রতিটি মৃত্যুও আলাদা হতে বাধ্য। তাই স্বেচ্ছামৃত্যুরও ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয়তা, অবস্থান আলাদাই হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডাক্তার, আইনজীবী ও নিকটাত্মীয়দের নিয়ে একটা কমিটি হবে যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সর্বসম্মতিক্রমে। 'মৃত্যুর অধিকার'— এই ধারণাটাই সারা বিশ্বে, সমস্ত দেশে চালু করার সময় হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে মরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। জীবন সুন্দর, এই পৃথিবী সুন্দর — বেঁচে থাকার তাগিদ কোনওদিন শেষ হবে না। তাই মৃত্যুর অধিকার কখনও কর্তব্যে পরিণত হবে না— যাতে কেউ মনে করবেন— এখন আমার কর্তব্য মৃত্যু বরণ করা। অর্থাৎ 'রাইট টু ডাই' কখনও 'ডিউটি টু ডাই' হয়ে যাবে না।

বাঁচার আনন্দ মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি। সেই আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে যদি জানি শেষে সুন্দর যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর আশ্রয় সুনিশ্চিত।

ইতালির কবি পিয়েরজার্জিও ওয়েলসবি গত এক দশক ধরে দুরারোগ্য পেশীর অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন। স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার চেয়ে কম্পিউটরের কি-বোর্ডে আঙ্গুল চালিয়েই লিখেছেন, 'লেট মি ডাই'। অদম্য ছিল কবির চিন্তাশক্তি। স্বেচ্ছামৃত্যু চেয়ে আইনি অধিকার চালিয়ে গেছেন প্রশাসন থেকে চার্চের অমানবিকতার বিরুদ্ধে। ২২শে ডিসেম্বর ২০০৬-এ তাঁর বন্ধু অ্যানেস্টেটিস্ট মারিও রিচ্চিও বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ দিয়ে চির - শান্তির ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। দিলেন অসহ্য কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি।

চির - নিদ্রায় যাওয়ার আগে কবি তাঁর বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। রিচ্চিও'র বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তাঁর পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন প্রচুর মানুষ। সোচ্চার মানুষের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।